চাই জীবনমুখী, মানবিক ও কর্মমুখী শিক্ষা

এ কলামে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে লিখে চলেছি। এর আগের কয়েকটা নিবন্ধে শিক্ষার ভিত্তিমূল ও উপকরণ বিষয়ে লিখেছিলাম। শিক্ষা, পরিবেশ, সমাজের বর্তমান অবস্থান, আমাদের অবস্থা, শিক্ষার গুরুত্ব, দেশের উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়েও লিখেছি। ফল কতটুকু পেরেছি এ নিয়ে আমি সন্দিহান। কারণ এদেশের মানুষ শিক্ষামুখী নয়, বরং রাজনীতিমুখী। যুব সমাজের বৃহদংশ শিক্ষাবিমুখ এবং সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকমুখী। মানুষ রাজনীতির পরিবর্তন ও ঘটনা নিয়ে যতটা না অবহিত, শঙ্কিত ও বিজড়িত থাকে, বলা যায় তার একশ ভাগের দশভাগও শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। অবশ্য রাজনীতির পরিবেশের ওপর শিক্ষামানের উন্নতি-অবনতি বহুলাংশে নির্ভরশীল, একথা সত্য। তাই কেউ যদি কাউকে প্রশ্ন করে, 'আপনাদের দেশে শিক্ষার দশা কেমন? এক কথায় এর উত্তর আসবে 'রাজনীতির দশা যেমন, তেমন'। দেশে শিক্ষামানের যদি অধঃপতন ও মানহীনতা হয়ে থাকে তার জন্য এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের অধঃপতনকেই সরাসরি দায়ী করা যায়। একমাত্র অভিভাবকরাই এজন্য উদ্বিগ্ন ও দিশেহারা। 'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভূ আশীবিষে দংশেনি যারে।' পরিবেশের কারণে যাদের ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এখনোও নষ্ট হতে চলেছে– তাদের অনুশোচনা ও ছটফটানি অন্য কেউ বুঝতে সমর্থ হবে না বা বুঝতে চাইবেও না। আমরা অর্থাৎ মাস্টারসাহেবদের অনেকেই তা সচোক্ষে দেখছি বলেই বলছি। বলছি, শিক্ষার উন্নয়ন মানেই সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন। একথা অস্বীকার করার জো নেই।

যাহোক, এর আগে শিক্ষার ভিত্তিমূল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'শিক্ষায় সাত-আর' (Seven Rs in Education)-এর কথা বলেছিলাম। সেগুলো হলো: পড়া (Reading); লেখা (WRiting); অঙ্ক (ARithmetic); ধর্ম (Religion); গবেষণা/পর্যবেক্ষণ (Research); জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ(Roused-conscience and Values); এবং ন্যায়নিষ্ঠা (Righteousness)। এছাড়াও শিক্ষার উপকরণ নিয়ে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছিলাম, যেগুলো হলো: শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রম। এ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার দাবি রাখে। আজ শিক্ষার অভিমুখিতা নিয়ে অল্প পরিসরে কিছু বলবো।

আমার বিশ্লেষণে প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষার অভিমুখিতা হবে তিনটি: এক. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা; এবং ৩. কর্মমুখী শিক্ষা। এ কলামেই বিষয়গুলো অন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অনেকবারই তুলে ধরেছি, যদিও ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়নি। সকল শিক্ষাই মূলত জীবনমুখী শিক্ষা বা জীবনের জন্য শিক্ষা। তবুও প্রত্যেক মানুষের সাবলীল ও সাধারণ জীবন নির্বাহ বা অতিবাহিত করার জন্য সাধারণভাবে বাস্তবকেন্দ্রিক কিছু শিক্ষা প্রতিনিয়ত কাজে লাগে, তা সে যে পেশাতেই থাকুক না কেন, এখানে জীবনমুখী শিক্ষা বলতে সেগুলোকেই বুঝাতে চাচ্ছি; এগুলোকে 'লাইফ স্কিলস'ও বলতে পারি। জীবনের প্রারম্ভেই স্কুল এবং বাড়িতে এগুলো ব্যবহারিকভাবে শেখা ও চর্চা করা প্রয়োজন। যেমন– যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা, টয়লেট ব্যবহার শেখা, মানুষের সাথে কথা বলা (আদবকেতা) শেখা, ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধারণ রান্না, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাস্তা পার হতে শেখা, যানবাহনে আরোহণ, শরীর চর্চা, সাঁতার শেখা, বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি, ট্রাফিক রুলস, দুর্যোগকালীন করণীয়, ভালো সুনাগরিক হতে শেখা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘরবাড়ি ও প্রাঙ্গণ), বিভিন্ন রকম গিরা (Knot) শেখা, মিথ্যা কথা না বলা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখা, নেশার ক্ষতিকর দিক ও পরিণতি, সেলাই করা-বোতাম-হুক লাগানো শেখা, কাপড় ধোয়া, ই-মেইল ম্যানার্স, টেলিফোন ম্যানার্স, টেবিল ম্যানার্স, সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখা, নিজের ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখা, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শেখার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা, সময়জ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান শেখা, হাতের কাজ (পুরোনো জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি), সর্বজনীন পরমত সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বজায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধ, প্রতিদিনের পত্রিকা পড়া, মানবাধিকার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, এদেশের সংবিধান সম্বন্ধে

সাধারণ জ্ঞান, ক্লাসের বইয়ের বাইরেও বই পড়া, কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার শেখা, অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি ও থিংকিং, প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি ইত্যাদি। সব শ্রেণির জন্য সব শেখা উপযোগী নয়। এগুলো কোনো একটা ক্লাসে একবার শেখালে চলবে না। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে ভাগ করে কোনো কোনোটা একাধিকবারও শেখাতে হবে।

মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা: সেই আদিকাল থেকে মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা চেতনায় সুষ্ঠু মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবতার বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব আছে বলেই আমরা মানুষ। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও শিক্ষা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করে। ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষায় সেক্যিউলারিজম এনে শিক্ষাকে ধ্বংস ও মানবজাতিকে লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। আমরা ভোগবাদে আসক্ত হয়েছি। সেক্যিউলারিজম হলো: 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ'। আলো না থাকলে আঁধার থাকাটাই স্বাভাবিক, তেমনি মানুষের মনের মনিকোঠায় ধর্ম ও নৈতিকতা না থাকলে অধর্ম ও দুর্নীতি থাকাটাই অনস্বীকার্য। মানুষের মন থেকে মনুষ্যত্ব যত দূরে সরে যাবে, মানুষ তত স্বার্থবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদ ও বন্যপ্রাণি-সাদৃশ হয়ে উঠবে। যে শিক্ষায় সততা, আদর্শ ও মনুষ্যত্ব নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন ও অচল। একমাত্র মনুষ্যত্বই পারে এ ভূ-পৃষ্ঠে মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখতে।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট এথিক্স, কোড অব প্রফেশনাল এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি নামে অনেক কোর্সই পড়ানো হচ্ছে। এগুলো ধর্মের আংশিক প্রতিস্থাপন। ধার্মিকতা শব্দটা এড়িয়ে গিয়ে বা ধর্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলোকে চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভ থেকে মনের গভীরে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ ভালোমতো প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে এথিক্সের সব মুখস্তবিদ্যা কাগুজে বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতে সমাজে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে মনুষ্যত্বহীন শিক্ষা ফলপ্রসূ হচ্ছে ও কোনো ভালো কিছু করতে পারছে কী-না আমরা সকলেই তা অবহিত। এ জন্য ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই মনুষ্যত্বের বীজ বপন করাটাই যুক্তিযুক্ত। মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা বলতে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলে এমন শিক্ষা বলা যায়। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সব অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজেই নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আত্মশুদ্ধি মানেই বিবেক বৃদ্ধি– জাগ্রত বিবেকের সৃষ্টি। ধর্মগ্রন্থে এসেছে, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে– যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে, যে নফসকে কলুষিত করেছে'।

ন্যায়নিষ্ঠা, মানবসেবার মনোভাব, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, সততা, চারিত্রিক অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা, সৎকর্মপরায়ণতা, ধর্ম-অহিংসতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রতিহিংসা-মুক্ততা, অকৃত্রিমতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, জেনেশুনে সত্য গোপন না করা, শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি সবই মনুষ্যত্বেও গুণ। এ গুণগুলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহিমান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। মানুষের মধ্যে এসব গুণের অনুপস্থিতি এদেশকে ভোগাচ্ছে। এসব গুণ যত বেশি ছাত্রছাত্রী ও মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যাবে, ততই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে। দেশের প্রতিটা পর্যায়ে মানুষ আইনের শাসন, সুনীতি ও ন্যায়বিচার পাবে। রাজনৈতিক উৎপীড়ন, লুটপাট ও নৈরাজ্য থেকে দেশ রক্ষা পাবে। এভাবেই আদর্শ মানুষ কর্তৃক আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এসব গুণকে ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে বাস্তব ট্রেইনিং আকারে বারবার গেঁথে দিতে হবে এবং প্রাকটিস করাতে হবে।

কর্মমুখী শিক্ষা: শিক্ষা মানুষকে কোনো না কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অনেকেই একধরনের কাজ করলে সেটা একটা পেশাতে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো পেশা থাকতে হবে, যেখান থেকে উপার্জিত অর্থ বা রোজগার দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করবে। অন্য কোনো প্রাণি প্রকৃতি থেকে খাবার সংগ্রহ করে খেয়ে বেঁচে থাকে। মানুষকে প্রয়োজনানুযায়ী মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনসামগ্রী সংগ্রহ করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের এমন কিছু শেখার প্রয়োজন, যে শিক্ষা ব্যবহার করে জীবিকার্জন করা সম্ভব। এজন্য কাউকে মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে কোনো টেকনিক্যাল কিংবা ভকেশনাল শিক্ষায় ট্রেইনিং নিয়ে পেশা বেছে নিতে হবে। কেউবা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে উচ্চ কোনো পেশায় যাবে। সার্টিফিকেটসর্বস্ব কোনো উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বেকারত্বের গ্লানি ভোগ করার চেয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে কোনো পেশাদারী হওয়া কিংবা ব্যবসা করা অনেক ভালো। অনেক টেকনিক্যাল বিদ্যাধারীকে আমি ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে অন্য কর্ম-অন্বেষিদেরকে সাথে নিয়ে ভালোভাবে ব্যবসা করতে দেখেছি। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে তাকে মনমতো পেশার দিকে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এ দায়িত্ব তার শিক্ষকের। এদেশে সরকারি-সেরকারি মিলিয়ে লাখ লাখ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। অসুবিধা হচ্ছে সেখানে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয় না। সার্টিফিকেট বিলি করা হয়। এ অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শক্ত কোনো ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। প্রাইমারি, হাইস্কুলসহ কলেজেরও একই অবস্থা। এটাও একটা দুষ্টচক্র (ভিশাস সার্কেল)। এই দুষ্টচক্রের কারণে দেশে জাত শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। এভাবেও শিক্ষা-পরিবেশের ক্রমাবনতি ঘটছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, মানুষ যেটাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে বেরিয়ে সহজে নতুনকে গ্রহণ করতে চায় না, এমন সংখ্যা শতকরা আশি ভাগের উপরে।

উচ্চশিক্ষার অবস্থাও বেশ খারাপ। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ভিত গড়ে না উঠলে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা আয়ত্ব করা কঠিন হয়। ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার স্বার্থে মান কমাতে বাধ্য হয়। হাতে গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়েও ইন্ডাস্ট্রী-কোল্যাবরেশন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেখানে যারা ভর্তি হয়, অধিকাংশই নিজ কিংবা পারিবারিক চেষ্টায় স্কুল-কলেজে ভালো লেখাপড়া শিখে আসে। বাকিরা মাতৃভাষা বাংলাটাও ভালোমতো পড়তে ও লিখতে পারে না। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নেই। সেখানকার মানের কথা বললে ইঁদুরও ফিক করে হেসে গর্তে লুকাবে।

যাহোক, এদেশে শিক্ষা মানের উন্নতি এতটা সহজ নয়। পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস যেমনই হোক, বাস্তবায়ন পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব আনতে হবে। শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, স্কুল পর্যায়ে এমন অগণিত শিক্ষক আছে যারা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, 'শিক্ষকদের জন্য প্রণীত ম্যানুয়াল'টাও পড়ে ঠিকমতো বুঝতে অপারগ। তাদের ট্রেইনিং দেওয়া না-দেওয়া একই কথা। যে দুধ ঘোলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, 'হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। প্রয়োজনে টাকা বেশি দিয়ে হলেও সুশিক্ষিত জাত শিক্ষকের সন্ধান করতে হবে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। জীবন বাঁচাতে শরীরের কোনো বিশেষ অঙ্গচ্ছেদ করা লাগতে পারে, সেটাকেও মেনে নিতে হবে। নইলে ভয়াবহ পরিণতি আসবেই। তা আমরা পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি যতই পরিবর্তন করি না কেন। আমরা সবাই অবহিত যে, এ অবস্থা আমরা দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক চাটুকারিতা, সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে উদারতা দেখিয়ে ও অব্যবস্থাপনা দিয়ে অর্জন করেছি।

(১৬ জানুয়ারি '২৪, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ